INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
*A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal*
*Volume-I, Issue-2, July-December 2025*

# অর্জুনের দ্বন্দ্ব থেকে গীতার নৈতিক শিক্ষা: সংকট ও সমাধানের এক নৈতিক-দর্শন ভিত্তিক বিশ্লেষণ

***Chameli Sharma**

**সারসংক্ষেপ:**

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পটভূমিতে অর্জুন এবং তাঁর সারথি শ্রীকৃষ্ণ-এর মধ্যেকার কথোপকথন, যা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে পরিচিত। গীতা কেবল একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, এটি মানবজীবনের সংকট ও কর্তব্যবোধের একটি শাশ্বত নৈতিক-দর্শন। গীতার শুরু অর্জুনের বিষাদময় অনুভব দিয়ে এবং মোহমুক্তিতে তার উপসংহার। তাঁর নৈতিক সংকটটি ছিল: রাজ্যলাভের জন্য এতগুলি জীবন নেওয়া কি ধর্মসম্মত? এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ যে পাপ হবে, তার দায়িত্ব কে নেবে? এই পরিস্থিতিতে অর্জুন যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেন এবং তাঁর এই দ্বিধাই গীতার নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করে। পাশ্চাত্য নীতিদর্শনের পরিভাষায় এই সংকটকে বলা হয় moral dilemma অর্থাৎ নৈতিক দ্বিকল্প। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রতি অর্জুনের নেতিবাচক মনোভাব যেকোনো সাধারণ নীতিবান ব্যক্তির কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে। কিন্তু কৃষ্ণ নিষ্কাম কর্ম-তত্ত্বের অবতারণা করে বলেন, কর্মের পূর্বে অথবা পশ্চাতে যেন কর্মফলের কামনা বা আসক্তি না থাকে। অর্জুনকে তিনি কর্মযোগের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। এই গ্রন্থ মানুষকে এমন কর্মে উদ্বুদ্ধ করে যেখানে আবেগের তাড়না নেই, কামনার প্রেরণা নেই। এই আত্মসংযমই এবং তাৎপর্য সম্পন্ন কর্তব্য বোধ গীতার নৈতিক আদর্শ। গীতার এই নৈতিক-দর্শন একটি গভীর জীবনমুখী বার্তা দেয়: মানবজীবনে যখনই কর্তব্য ও আবেগের মধ্যে সংঘাত তৈরি হয়, তখনই নিষ্কাম কর্ম, আত্মার জ্ঞান এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি — এই তিনটি নীতিকে অবলম্বন করতে হবে। অর্জুনের সংকটটি আসলে প্রতিটি মানুষের জীবনের প্রতি মুহূর্তের সংকট। গীতা শেখায়, কেবল সঠিক কর্তব্য (ধর্ম) পালন করে যেতে হবে, ফল যা-ই হোক না কেন।

**মূলশব্দ** - নৈতিক সংকট, মোহমুক্তি,কর্মযোগ, নিষ্কাম কর্ম, স্বধর্ম, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

* *Research Scholar, Department of Philosophy, Binod Bihari Mahato Kolyanchal University*

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
*A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal*
*Volume-I, Issue-2, July-December 2025*

কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের মোহ তাঁকে বিষাদে নিমগ্ন করেছিল। সেই বিষাদের মূল কারণ হল দ্বন্দ্ব। কৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বিমূঢ় অর্জুনকে দ্বন্দ্বের অবসান দেখিয়ে দিলেন। মোহমুক্তিতে উত্তরণের পথটি সহজ নয়। অর্জনকে সেই পথের সন্ধান দিতে শ্রীকৃষ্ণ যে নৈতিক পরিক্রমা করেছেন তাই গীতার উপদেশ। তারই মধ্যে আমরা পাই গীতায় প্রচারিত কর্তব্যের ধারণা যা মূলত: বর্ণধর্ম ও স্বধর্মের ধারণার মধ্যে নিহিত। অর্জুনের বিষাদ থেকে কৃষ্ণের উপদেশের জন্ম হয়। এই উপদেশের প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য জানার জন্য প্রথমত: অর্জুনের বিষাদকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে কৌরবদের সাথে যুদ্ধ করার অভিপ্রায় নিয়ে অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তিনি কৃষ্ণকে প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাদলের মধ্যে রথ স্থাপন করতে বলেছেন- নীতিহীন ভাবে কৌরবরা যে রাজ্য জয় করেছে তা পুনরুদ্ধার করা তার কর্তব্য, তাই অর্জুন এই মহাযুদ্ধে অংশ নেন। বর্ণগতভাবে তিনি ক্ষত্রিয়। তাই যুদ্ধে স্বভূমি রক্ষা করা তাঁর বর্ণোচিত ধর্ম। কিন্তু তিনি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন তখন তিনি ব্যথিত হলেন এই জন্য যে যুদ্ধে লোকক্ষয় অনিবার্য এবং তাঁর প্রতিপক্ষ যেহেতু কৌরব বংশজাত তাই তাঁরা সকলেই তাঁর পরমাত্মীয়। শুধু তাই নয়, প্রতিপক্ষের মধ্যে তাঁর গুরু বা আচার্যস্থানীয় ব্যক্তিরাও উপস্থিত। যুদ্ধে যদি অনিবার্যভাবে স্বজন বিনাশ হয় তার জন্য অর্জুনই সর্বতোভাবে দায়ী হবেন। যুদ্ধ করা তাঁর কর্তব্য হলেও রাজ্যের লোভে স্বজনদের নিধন করা তার কর্তব্য হতে পারে না।

অর্জুন এই যুদ্ধকে সমর্থন করতে পারেন নি কারণ এই যুদ্ধে প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় জনের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই যুদ্ধে লিপ্ত হলে স্বজনহত্যা পাপে লিপ্ত হবে। তাছাড়া কৌরবরা বিনষ্ট হলে কৌরব বংশই ধ্বংস হবে। কুলক্ষয় হলে চিরাচরিত কুলধর্ম নষ্ট হয় আর কুলনারীগণ ব্যাভিচারিণী হন এবং বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি হয়। কুলগণের পিতৃপুরুষগণ এর ফলে নরকে পতিত হন। এই অশুভ চিন্তায় অর্জুন দেহ ও মনে বিষাদে নিমগ্ন হলেন। অর্জুন এই পরিস্থিতিতে বিপন্ন ও বিষণ্ণ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ক্ষত্রিয় বংশজাত মানুষ হিসাবে যুদ্ধ তাঁর কর্তব্য। আবার যুদ্ধের পরিণামে কুলক্ষয় রোধ করার জন্য যুদ্ধ থেকে বিরত থাকাও তাঁর কর্তব্য। এই পরস্পর বিরোধী দুটি কর্তব্য তাদের বিপরীতমুখী দাবী নিয়ে অর্জুনের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। একটি কর্তব্যকে স্বীকার করলে অন্য কর্তব্যকে উপেক্ষা করতে হয়, অর্থাৎ দুটি কর্তব্যকে একসঙ্গে পালন করা যায় না। তিনি ধনুর্বান ত্যাগ করে কৃষ্ণের কাছে একথা নিবেদন করলেন যে যাদের জন্য রাজ্য, ভোগ্যবস্তু ও সুখ আকাঙ্খিত হয় সেই সকল স্বজন ধন ও প্রাণ ত্যাগ করতে কৃতসঙ্কল্প হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন। স্বজন হত্যা করে সর্গও লাভ করতে চাই না।

অর্জুনের সামনে এমন পরিস্থিতি উপস্থিত হয়েছিল যার জন্য তিনি বিষাদগ্রস্ত। তিনি তাঁর সারথি ও উপদেষ্টা কৃষ্ণের কাছে পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের উপদেশ দিতে অনুরোধ করেছেন। অর্জুন এখানে দুটি পরস্পরবিরোধী কর্তব্যের আহ্বানে দিশাহারা। তাই যেখানে দুটি বিকল্প কর্তব্যের আহ্বান আসে সেখানে আমরা কর্তব্য নির্ধারণে দ্বিধাগ্রস্ত হই, কারণ উভয় কর্তব্যকে একযোগে পালন করা সম্ভব নয় আবার কর্তব্য কখনই উপেক্ষণীয় নয়। এই পরিস্থিতি, যাকে কর্তব্যের সঙ্কট বলা যেতে পারে, পাশ্চাত্য নীতিদর্শনে তাকে নৈতিক দ্বিকল্প বা moral dilemma বলা হয়। এই শব্দটি পাশ্চাত্য নীতিদর্শন থেকে সঙ্কলিত হয়েছে। সুতরাং পাশ্চাত্য স্নীতিদর্শনে এই দ্বিকল্পের সংজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত বিচার বিশ্লেষণ করে আমাদের পক্ষে এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা গঠন করা সম্ভব এবং একই সঙ্গে একথাও

জানা সম্ভব যে অর্জুনের মনে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল তাকে নৈতিক দ্বিকল্প বলা সঙ্গত কিনা।

সুতরাং এখানে নৈতিক দ্বিকল্পের স্বরূপ নির্ণয় করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে নীতিদার্শনিক ও যুক্তিবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ নেই, তবে নৈতিক দ্বিকল্পের সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে অশেষ বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। কোন কোন পন্ডিতের মতে নৈতিক দ্বিকল্প আদৌ সম্ভব নয়। একথা স্বীকার করলে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং যা তাকে বিমূঢ় করেছিল তার আবার মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। সেই পরিস্থিতি কি নৈতিক দ্বিকল্প নামে আখ্যাত হতে পারে? অর্জুনের বিষাদের কারণ অনুসন্ধানে এই দুটি প্রশ্নের সমাধান করা প্রয়োজন। অর্থাৎ সেই পরিস্থিতিকেই নৈতিক দ্বিকল্প বলা হয় যেখানে একজন ব্যক্তির Y কাজটি করা উচিত এবং Z কাজটিও করা উচিত, কিন্তু দুটি কাজই একসঙ্গে করা তার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ হয়ত এই যে একটি কর্তব্য পালন করার অর্থ অন্য কর্তব্যটিকে পালন না করা, অথবা পরিস্থিতি এমন যে দুটি কর্তব্যকে একই সঙ্গে পালন করতে দেয় না।

নৈতিক দ্বিকল্পের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন। অনেকের মতে যাঁরা নৈতিক দ্বিকল্পের সম্ভাবনায় বিশ্বাসী তাঁরা এই বিষয়ে যে দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন তার মধ্য থেকেই এই দ্বিকল্পের একটি সংজ্ঞা গঠন করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে Sartre-র একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়। দৃষ্টান্তটিতে একটি যুবকের কথা বলা হয়েছে যার সামনে দুটি কর্তব্য উপস্থিত প্রথম কর্তব্যটি হল যুবকটির তার অসুস্থ মায়ের কাছে থাকা উচিত এবং দ্বিতীয় কর্তব্য হল ইংল্যাণ্ডে Free French Force এ যোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু যুবকটি দুটি কর্তব্য একই সঙ্গে পালন করতে পারে না। একটি কর্তব্য একজন ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রেরিত এবং অপরটি জাতীয় প্রয়োজন নিষ্ঠ। যুবকটি এইভাবে দুটি ভিন্ন জাতীয় কর্তব্যের সম্মুখীন হয় যার মধ্যে একটিকে নির্বাচন করতে হবে। আলোচ্য দৃষ্টান্তে একটি নৈতিক সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে - যুবকটির পক্ষে তার মায়ের কাছে থাকা উচিত, আবার একই সঙ্গে সেনাদলে যোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু যুবকটি একই সঙ্গে দুটি কর্তব্য পালন করতে পারে না সে একই সঙ্গে মায়ের কাছে থেকে সেনাদলে যোগ দিতে পারে না। মায়ের সঙ্গে থাকলে সেনাদলে যোগ দেওয়া যায় না, আবার সেনাদলে যোগ দিলে মায়ের কাছে থাকা যায় না। নৈতিক দ্বিকল্পের একটি আকারগত চিত্র এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল প্রাচ্যের মহাকাব্য থেকে নৈতিক দ্বিকল্পের অনেক গুলি উদাহরণ আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। সেগুলি বিশ্লেষণ করে দ্বিকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরও স্পষ্টভাবে জানা যেতে পারে। মহাভারতের কর্ণপর্বে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে যেখানে অগ্নিদেব অর্জুনকে গাণ্ডীব নামক ধনুক প্রদান করেছিলেন। অর্জুন অগ্নিদেবতার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যদি কোন ব্যক্তি গাণ্ডীবের নিন্দা করে তাহলে অর্জুন তাকে বধ করবে। কর্ণ দ্বারা অপমানিত হয়ে, যখন যুধিষ্ঠির পাণ্ডব শিবিরে পৌঁছান, তখন যুধিষ্ঠির গাণ্ডীবসহ অর্জুনকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেন কেননা অর্জুন যোদ্ধাদের বধ করতে ব্যর্থ হয়। গাণ্ডীবের এই অসম্মানে অর্জুন ক্ষিপ্ত হলেও তাঁর সামনে একটি নৈতিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় হয় তাঁকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করতে হবে অথবা তাঁকে অগ্নিদেবতার কাছে প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হবে। এখানে দুটি নীতির মধ্যে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত উপস্থিত হয়েছে একদিকে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার নীতির প্রতি দায়বদ্ধতা

এবং অপরদিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণরক্ষা। আলোচ্য দৃষ্টান্তে প্রতিজ্ঞা পালন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণরক্ষা করা একই সঙ্গে সম্ভব নয়। ভ্রাতার প্রাণরক্ষা করলে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না, আবার প্রতিজ্ঞা পালন করতে গেলে ভ্রাতার প্রাণরক্ষা হয় না। দুটি কর্তব্য একই সঙ্গে পালন করা যায় না। এরই নাম নৈতিক দ্বিকল্প। বিমলকৃষ্ণ মতিলাল নৈতিক দ্বিকল্পের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাকে বিশ্লেষণ করলে এই দ্বিকল্পের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, মানুষের কাছে অনেক সময়ে দুটি নৈতিক দায়বদ্ধতা থাকে (moral obligation)। পরিস্থিতি এমন হয় যে একটি দায়বদ্ধতাকে উপেক্ষা না করলে অন্যটি পালন করা যায় না। দুটি বিকল্প কর্তব্যের মধ্যে কোনটিকে পালন করা হবে তার নির্ণায়ক কোন যুক্তি থাকে না। এই নির্বাচন করা হয় এমন ভিত্তির উপর যাকে নৈতিক ভিত্তি বলা যায় না।

ভগবদ্গীতায় অর্জুনের বিষাদকে নৈতিক দ্বিকল্পজাত বলে আমরা বর্ণনা করেছি। এখানেও যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সামনে কর্তব্যের দ্বিধা দেখা দেয় যেখান থেকে প্রকৃত দায়িত্ব নির্বাচন করা কঠিন। আমরা মনে করি যে কুরুক্ষেত্রের রণভূমিই অর্জুনের নৈতিক দ্বিকল্পের পটভূমি। অবশ্য আমাদের বিশেষ যত্ন সহকারে দেখা প্রয়োজন যে অর্জুন বাস্তবিক এই জাতীয় দ্বিকল্পের সম্মুখীন হয়েছিলেন কি না। অনেকে মনে করেন যে অর্জুনের সামনে যে পরিস্থিতি উপস্থাপিত হয়েছে তা কোন নৈতিক দ্বিকল্পের সমস্যা নয়। আবার অনেকে মনে করেন নৈতিক দ্বন্দ্বের ধারণাটি স্বরূপতঃ অবান্তর। সেক্ষেত্রে অর্জুনের মানসিক অবস্থার পূর্ণবিবেচনা করা

প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্যকেও উপলব্ধি করা যায় না। অর্জুনের বিষাদের কারণ কী? প্রয়োজন। অর্জুনের বিষাদের স্বরূপ না জানলে কৃষ্ণের উপদেশের সঙ্গতি, অর্জন বলেছেন "দৃষ্টেমান স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসু সমবস্থিতান। সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।" অর্থাৎ যুযুৎসু স্বজনকে রণক্ষেত্রে অবস্থিত দেখে আমার করচরণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবসন্ন ও মখ শুষ্ক হয়েছে। আমি তাই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্তি কামনা করি। এমন পরিস্তিতিতে অর্জন অনুভব করে যুদ্ধে যোগদান না করা তার কর্তব্য। এই পরিস্থিতিকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে অর্জনের সামনে দটি কর্তব্য উপস্থিত যার মধ্যে কোন বিকল্পও কে উপেক্ষা করতে পারি না। প্রথমতঃ যুদ্ধ করা অর্জনের কর্তব্য কারণ, তিনি ক্ষত্রিয় এবং যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের বর্ণোচিত কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ আবার একই সঙ্গে যুদ্ধের পরিণামে কুলক্ষয় রোধ করা তার কর্তব্য। কুলক্ষয় যেহেতু যুদ্ধেরই পরিণাম তাই কুলক্ষয় রোধ করার জন্য যুদ্ধ না করা কর্তব্য। অর্জুনের বিষাদের কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তর গীতার প্রথম অধ্যায়ে ২৭ সংখ্যক শ্লোকে পাওয়া যায়। যেখানে অর্জুন বলেছেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনদের নিরীক্ষণ করে তিনি বিষণ্ণত অর্থাৎ নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত বন্ধুবান্ধব ও স্বজনদের দেখে অর্জুন অত্যন্ত কাতর ও বিষণ্ণ হয়ে ছিলেন। কিন্তু আমরা মনে করি যে নৈতিক দ্বিকল্পের উপস্থিতি অর্জুনের বিষাদের কারণ।

নৈতিক দ্বিকল্প আমাদের সামনে একটি প্রশ্নকে উপস্থিত করে আমরা কিভাবে এই দ্বিকল্প এবং তার কারনে দ্বিধা সেটা কে অতিক্রম করতে পারি। অর্থাৎ এই দ্বিকল্পের একটি সমাধান সূত্র আমাদের প্রত্যাশিত। বিভিন্নভাবে নৈতিক দ্বিকল্পের সমাধানের প্রচেষ্টা করা যেতে পারে। যেমন- দুটি পরস্পরবিরোধী বিকল্প কর্তব্যের মধ্যে যদি এমন কোন কর্তব্যের দাবী থাকে যা অন্য কর্তব্যের দাবীকে বাতিল করে (overrides) তাহলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু

অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিকল্প দুটি কর্তব্যই তুল্যবল হওয়ার জন্য একটি অপরটিকে বাতিল করে না। তাই বাস্তব পরিস্থিতিতে কোন বিকল্পটি পালনীয় সে বিষয়ে কোন নির্দেশ আমরা পাই না। এর ফলে কোন্টি আমাদের কর্তব্য তা নির্ণয় করা সহজ হয় না।

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল নৈতিক দ্বিকল্পের অন্তর্গত দুটি বিকল্পকে irreconcilable বলে উল্লেখ করেছেন। একথা যদি আমরা স্বীকার করি তাহলে নৈতিক দ্বিকল্পের কোন সমাধান সূত্র পাওয়া যাবে না। নৈতিক দ্বিকল্পের ক্ষেত্রে আমরা জানি না যে কোন কর্তব্যটি overriding, যেমন যুদ্ধ করা (ক্ষত্রিয় বংশজাত বলে) এবং যুদ্ধ না করা (প্রতিপক্ষের সেনাদলে আত্মীয়বর্গ আছে বলে) এই দুটি বিকল্পের মধ্যে কোন্ বিকল্পকে overriding বলা সঙ্গত তা নির্ণয় করা সহজ নয়। যে বিকল্পকে overriding বলে গণ্য করা হবে তা একটি যক্তিহীন বা irrational নির্বাচন হবে, যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত হবে না। তাই অর্জনের মতো ব্যক্তির পক্ষে নৈতিক দ্বিকল্প থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এই বিষয়টিকে অন্যভাবেও দেখা সম্ভব। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, একথা কি সত্য যে অর্জন বাস্তবিক একটি দ্বিকল্পের সম্মুখীন হয়েছিলেন? কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক মনে করেছেন যে উপরোক্ত নৈতিক দ্বিকল্পের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী দুটি কর্তব্যের দাবী হয়ত উপস্থিত ছিল না। অর্জন আপাতদৃষ্টিতে একজন অখণ্ড ব্যক্তি হলেও তাঁর মধ্যে দটি সত্তা ছিল- ক্ষত্রিয় সত্তা এবং পাণ্ডব সত্তা। এই দুটি সত্তা অভিন্ন নয়। অর্জনকে যখন আমরা ক্ষত্রিয়রূপে দেখি তখন তাঁর একটি বর্ণ আমাদের কাছে প্রধান হয়ে ওঠে। আবার অর্জনকে যখন আমরা পাণ্ডবরূপে দেখি তখন তাঁর সত্তার অপর একটি পরিচয় আমাদের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। সেই সত্তাটি বর্ণভিত্তিক নয়, বরং বংশভিত্তিক। বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মধ্যে এইরকম একাধিক সত্তার সমন্বয় হয়ে থাকে। আমরা কখনও একটি সত্তাকে মুখ্য বা প্রধান বলে গণ্য করি এবং কখনও অপর একটি সত্তাকে মুখ্য বলে জানি।

দুটি কর্তব্যের পরস্পরবিরুদ্ধ দাবী নিয়ে অর্জুন বিচলিত কেন? আমরা দেখেছি যে অর্জুনের মধ্যে আছে এক দ্বিখণ্ডিত সত্তা, যারা পরস্পরবিরোধী না হলেও পরস্পর ভিন্ন। দুটি ভিন্ন ভিন্ন সত্তার কাছে দুটি ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্যের দাবী দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্তব্যের দ্বন্দ্বকে এইভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আমরা বলতে বাধ্য হই যে নৈতিক দ্বিকল্পের অস্তিত্ব নেই। Y এর কর্তব্য যদি Z এর কর্তব্যের আদেশের বিরোধী হয় তাহলে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বগত সম্পর্ক কল্পনা করাও অর্থহীন। তার কারণ ব্যক্তিভেদে কর্তব্যভেদ অবশ্যই হতে পারে কিন্তু তার দ্বারা দুটি কর্তব্যের মধ্যে সংঘাত বা দ্বন্দ্ব আছে এমন কথা বলা যায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় যে অর্জুনের সামনে দুটি কর্তব্য একযোগে উপস্থিত থাকলেও কর্তব্য দুটির মধ্যে দ্বন্দ্ব নাও থাকতে পারে। ক্ষত্রিয় অর্জুন এবং পাণ্ডব বংশোদ্ভূত অর্জুন যদি দুটি ভিন্ন সত্তা হয় তাহলে তাদের কর্তব্য ভিন্ন হতে পারে কিন্তু এই ভিন্নতার মধ্যে দ্বন্দ্বের বীজ নেই। নৈতিক দ্বিকল্প তখনই সম্ভব যদি দুটি পরস্পর বিরোধী কর্তব্য একই ব্যক্তির কাছে তাদের দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়। নৈতিক দ্বিকল্প যদি মিথ্যা হয় তাহলে তার সমাধানের প্রশ্ন ওঠে না।

অর্জুনের যে দুটি সত্তার কথা বলা হয়েছে তারা পরস্পরভিন্ন হলেও 'অর্জুন' নামক একই ব্যক্তিতে আশ্রিত। তাই স্বভাবতই এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে অর্জুন তাঁর কোন্ সত্তাটিকে প্রাধান্য দেবে। অর্জুন যদি তাঁর ক্ষত্রিয় সত্তাকে প্রাধান্য দেন তাহলে তাঁকে যুদ্ধ করতে

হবে, আবার অর্জুন যদি তাঁর পাণ্ডব সত্তাকে প্রাধান্য দেন এবং তিনি কৌরবদের আপনজন এই পরিচয় তাঁর কাছে প্রধান হয়ে ওঠে- তাহলে যুদ্ধে যোগদান করাকে তিনি তাঁর কর্তব্য বলে মনে করবেন না। একজন ব্যক্তি তাঁর বিভিন্ন পরিচয়ের মধ্যে কোন পরিচয়টিকে প্রধান বলে মনে করবেন তা সেই ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে প্রবেশ করার পর অর্জন যখন তাঁর প্রতিপক্ষের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তাঁর দ্বিতীয় সত্তাটি প্রাধান্য লাভকরে। অর্জন একজন পাণ্ডব এবং কৌরবদের ভ্রাতা এই পরিচয় মেনে নিলে অর্জুনের কাছে একটি কর্তব্যই বাধ্যতামুলক হয় স্বজনকে হত্যা করা তাঁর কর্তব্য হতে পারে না। তাঁর ক্ষত্রিয় সত্তাটি অনেকটাই নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। তাই ক্ষত্রিয় সত্তাটি তাঁর কাছে কোন দাবী পেশ করে নি। তাই এখানে নৈতিক দ্বন্দ্ব বা দ্বিকল্পের প্রশ্ন ওঠে না।

একটি প্রশ্ন এখানে আলোচনার যোগ্য বলে মনে হয়। কোন একটি বিশেষ সত্তার প্রাধান্য সম্পর্কে অর্জুনের সিদ্ধান্ত কীভাবে নির্ধারিত হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে যায়। অর্জুন অবশ্যই নিজেকে প্রধানত: ক্ষত্রিয় বলে মনে করতে পারতেন। কিন্তু এই পরিচয়কে স্থগিত রেখে তিনি তাঁর অপর পরিচয়টিকে মুখ্য বলে মনে করেছিলেন। বিকল্প সত্তার পরিচয়টি যদি প্রধান হয়ে উঠতো তাহলে নৈতিক দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা থাকত না। ক্ষত্রিয় বর্ণকেন্দ্রিক সত্তাটি কখনও কখনও মানবিকতার ধর্মমন্ডিত সত্তার তুলনায় মহান হয়ে উঠতে পারে। তাই একটি সত্তার আদেশ অপর সত্তার কাছে অপ্রাসঙ্গিক বলে গণ্য হয়। এ দুটি সত্তা একই কর্তব্যের কথা বলে না তাই নৈতিক দ্বিকল্প এখানে জন্মলাভ করে না। এই প্রসঙ্গে অর্জুনের বিষাদ ও নৈতিক দ্বিকল্প সম্পর্কে রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিশ্লেষণ ও মন্তব্য আলোচনার দাবী রাখে। তাঁর বক্তব্যের মূল কথা এই যে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে অর্জুনের কোন যুক্তিকেই কৃষ্ণ খন্ডন করতে সফল হয় নি। অর্জুনের বিরুদ্ধে কৃষ্ণ যে বক্তব্য উপস্থিত করেছেন তা যথার্থরূপে যুক্তি সঙ্গত নয় যদিও অর্জুন তাঁর কাছে নতিস্বীকার করেছেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতে অর্জুনের কাছেও তাঁর বক্তব্য সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছিল যদিও তার এই ব্যক্তিগত মনোভাব কৃষ্ণের বক্তব্যকে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণ করতে পারে না। রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে অর্জুন তাঁর শত্রুপক্ষের মধ্যে যাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করলেন তাঁরা তার শ্রদ্ধাভাজন স্বজন। স্বজন দুর্জন হলেও তাদের হত্যা করা নীতিগতভাবে অন্যায়। যুদ্ধের ফলে কুলক্ষয় হতে বাধ্য। কুলধর্মকে বিনষ্ট করা অনৈতিক কাজ। সুতরাং অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করা নৈতিক কর্তব্য হতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা নৈতিক দ্বিকল্পের একটি সমাধানসূত্র হয়ত পেতে পারি, কিন্তু সূত্রটি যেহেতু ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল এবং সেই সিদ্ধান্ত যেহেতু যুক্তিনির্ভর নয় তাই এইভাবে নৈতিক দ্বিকল্পের সমাধান করা যায় না। এই বিষয়ে অর্জুন বা যে কোন মানুষের ব্যর্থতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করবে যে নৈতিক দ্বিকল্পের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই দুটি দাবী অর্জুনের কর্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করলেও একটি দাবীকে স্বীকার করলে অপর দাবীটিকে অস্বীকার করতে হয়। নৈতিক দ্বিকল্প একটি বিশেষ মানসিকতার জন্ম দেয় যার নাম দ্বিধা। অর্জুন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন যা পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে যে তিনি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তা নৈতিক দ্বিকল্প বলে আখ্যাত হতে পারে। আমাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী অর্জনের বিষাদ নৈতিক দ্বিকল্প জনিত, শুধুমাত্র প্রতিপক্ষের সেনাদলের মধ্যে আত্মীয়বর্গ উপস্থিত আছেন একথাই তার বিষাদের হেতু নয়, কারণ এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে তিনি একমুখী একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন নি।

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
*A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal*
*Volume-I, Issue-2, July-December 2025*

তাই অর্জুনের বিষাদকে আমরা নৈতিক দ্বিকল্প জনিত বলে বর্ণনা করতে পারি। নৈতিক দ্বিকল্পের সম্ভাবনা ও বাস্তবতা সম্পর্কে মনে হয় সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে দ্বিকল্প জনিত কর্তব্যের সংঘাত বা বিরোধিতা থেকে কোনভাবে মুক্তি লাভ করা সম্ভব কি? এই প্রশ্নের উত্তর যদি নেতিবাচক হয় অর্থাৎ এই দ্বিকল্প থেকে মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা যদি না থাকে তাহলে যে ব্যক্তি দ্বিকল্পের সম্মুখীন হয়েছে সে কর্মহীন হয়ে পড়বে কারণ দুটি বিকল্পই তার কাছে নিরঙ্কুশ ভাবে কোন দাবী উপস্থাপন করতে পারবে না যদি কর্তব্য দুটি সম শক্তিমান হয়। যেমন অর্জুনের পক্ষে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা এবং ভ্রাতৃহত্যা করা কোনটিই কার্যকর হবে না। অতএব দুটি বিকল্পের মধ্যে কোন একটি পক্ষের দাবী পূরণ করার জন্য একটি বিকল্পকে তুলনামূলক ভাবে গ্রহণযোগ্য বলে জানতে হবে। আমাদের পক্ষে বিচার করা প্রয়োজন যে নৈতিক দ্বিকল্প থেকে মুক্ত হবার কোন সম্ভাবনা আদৌ আছে কি না। যদি তা থাকে তাহলে অর্জুন অবশ্যই তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ পাবেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রতি অর্জুনের বিরূপ মনোভাব যে কোন স্বাভাবিক নীতিবোধ সম্পন্ন মানুষের কাছেগ্রাহ্য বলে মনে হবে। কিন্তু কৃষ্ণ সমাজের চতুবর্ণের পরিপ্রেক্ষিতে এই মনোভাব পর্যালোচনা করেছেন। কৃষ্ণের কাছে এই বর্ণবিভাগ স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ প্রশ্নাতীত ভাবে সত্য। বর্ণ ধর্মের আলোচনায় ক্ষত্রিয়ের যে কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছে তার ভিত্তিতে ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করাকেই ক্ষাত্র ধর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষ্ণ তাঁর বক্তব্য অর্জুন যুদ্ধ করবেন অথবা করবেন না। ১. অর্জুন যদি যুদ্ধ না করেন তাহলে তাঁর কাজ ক্ষত্রিয়োচিত নয় বলে নিন্দিত হবে। আবার ২. অর্জুন যদি যুদ্ধ করেন তাহলে তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করবেন, অথবা পরাজিত হবেন। যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করলে তিনি স্বর্গারোহণ করবেন এবং বিজয়ী হলে তিনি সমগ্র রাজ্যের অধিপতি হবেন। সুতরাং ধর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে অর্জুনকে যুদ্ধ করাই কর্তব্য বলে নির্দেশ দেন তার পথপ্রদর্শক কৃষ্ণ। তিনি নির্দেশাবলীর যুক্তিকে আরও শানিত করেছেন তাঁর আত্মতত্ত্বের ভিত্তিতে। অর্জুনকে যুদ্ধে প্রণোদিত করার জন্য তিনি এমন একটি যুক্তির অবতারণা করেছেন যা বর্ণধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয়। এই নব উপস্থাপিত যুক্তির উদ্দেশ্য ছিল লোকক্ষয় সম্পর্কে অর্জুনের বিশ্বাসকে মিথ্যা প্রমাণিত করা। যুদ্ধে লোকক্ষয় সম্বন্ধে অর্জুনের বিশ্বাস যদি মিথ্যা হয় তাহলে স্বজনবধ জনিত পাপ তাকে স্পর্শ করবে অর্জুনের এই বিশ্বাসও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে। কৃষ্ণ তাঁর তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অর্জুনের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে স্বজনহত্যা অথবা সাধারণভাবে হত্যার ধারণাটি মিথ্যা। একথা প্রমাণ করার জন্য রাজেন্দ্রপ্রসাদ কৃষ্ণের যুক্তিকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন।

প্রথমত: আত্মার দেহভিন্নত্ব কৃষ্ণের আত্মতত্ত্বের অন্যতম বিষয়। ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শনে আত্মাকে অশরীরী বলা হয়েছে যা অকর্তা, অবিনাশী এবং জন্মমৃত্যবিহীন। শরীরের জন্ম এবং মৃত্যু আছে। আত্মা জন্ম মৃত্যুহীন। জীবের আত্মা যখন দেহ থেকে বিযুক্ত হয় তখন তাকে মৃত্যু বলা হয়। মৃত্যু দেহের ধর্ম। আত্মা বিদেহী এবং সেইজন্য অবধ্য। আবার আত্মা অকর্তা। তাই আত্মা ঘাতক হতে পারে না। সুতরাং লোকক্ষয়ের জন্য অর্জুন নিজেকে দায়ী করতে পারেন না কারণ আত্মস্বরূপ অর্জুন ঘাতক নয়। অতএব কোন কারণেই অর্জুনের পক্ষে নিজেকে অপরাধী মনে করা উচিত নয়। কৃষ্ণের যুক্তির অপর অংশে বলা হয়েছে যে জীবের দেহ বিনাশশীল। প্রত্যেক জীবের মৃত্যু পূর্বনির্ধারিত। তাই যুদ্ধে স্বজনদের মৃত্যু পূর্বনির্দিষ্ট এবং মৃত্যুতে তার শরীরেরই বিনাশ হয়। সুতরাং যুদ্ধে যে লোকক্ষয় হয় তা যেহেতু পূর্বনির্ধারিত তাই মৃত্যু ও হত্যার

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
*A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal*
*Volume-I, Issue-2, July-December 2025*

জন্য অর্জুনকে দায়ী করা যায় না। যে হত্যা বা লোকক্ষয়ের জন্য অর্জুন দায়ী নন তার জন্য শোকগ্রস্ত হওয়া অর্জুনের পক্ষে অর্থহীন। একজন মানুষ অপর একজন মানুষের মৃত্যুর নিমিত্ত হতে পারেন কিন্তু সেই মৃত্যু পূর্বনির্ধারিত কারণ তা ঈশ্বরের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে। অর্জুনের তির তার স্বজনদের বক্ষবিদীর্ণ করে তাদের মৃত্যু ঘটাতে পারে। কিন্তু তার জন্য কোন পাপ অর্জুনকে স্পর্শ করবে না। কারণ স্বজনদের মৃত্যু পূর্বানির্ধারিত। অতএব অর্জুনের বিষাদের কোন কারণ নেই। হত্যাও অনৈতিক বলে গণ্য হবে না। মানুষ হত্যা করে কারণ তার এই কর্মই পূর্বনির্ধারিত।

এই দৃষ্টিভঙ্গি যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে মানুষের কোন কাজকে প্রশংসনীয় অথবা নিন্দনীয় বলাও যাবে না। আমাদের সমস্ত কর্ম হবে নিন্দা ও প্রশংসার অতীত। কৃষ্ণ তাঁর জ্ঞাণ দানের মধ্যে দিয়ে অর্জুনের কাছে একথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে দেহের বিনাশ সম্ভব হলেও অবিনাশী আত্মাকে বধ করা যায় না। অর্জুন এই তত্ত্ব স্বীকার নাও করতে পারেন। কিন্তু তার ফলে কৃষ্ণের পূর্বোক্ত যুক্তি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা মিথ্যা হয়ে যায় না। অর্জুনকে যুদ্ধে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই তত্ত্ব যদি পর্যাপ্ত না হয় সেইজন্য পরিশেষে কৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মের কথা বলেছেন। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি কর্মের ফলভোগের প্রতি নিরাসক্ত থাকতে বলেছেন। যে যুদ্ধ নিরাসক্ত তার ফল অর্জুনকে স্পর্শ করবে না। অর্জুনের পাপভোগের আশঙ্কা করার কোন প্রয়োজন নেই। কৃষ্ণের যুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য এই যে অর্জুনের যুদ্ধে যোগ দেওয়া কর্তব্য।

এই প্রসঙ্গে বিমলকৃষ্ণ বিশ্বাস করেন যে নৈতিক দ্বিকল্পের ধারণাটি মিথ্যা নয় অর্থাৎ আমাদের জীবনে নৈতিক দ্বিকল্প একটি বাস্তব ঘটনা। এই দ্বিকল্প যে শুধুমাত্র সম্ভব তা নয়, তার সমাধানও অসম্ভব নয়। নৈতিক দ্বিকল্পের সমাধানের জন্য কোন প্রাকৃসিদ্ধ সূত্র নেই। বিভিন্ন সংস্কৃতি, সামাজিক পরিমণ্ডল বা মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে তার সমাধান হতে পারে। এইভাবে বিশ্লেষণ করলে কান্ট এবং কৃষ্ণের নৈতিক ধারণার মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়। কান্টের কাছে নৈতিক ধারণা অনমনীয় অর্থাৎ সেখানে বাস্তববোধের কোন প্রভাব নেই। কিন্তু কৃষ্ণ আমাদের নীতিবোধের নমনীয়তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন যার ফলে দুটি বিকল্পের মধ্যে কোন একটি বিকল্প হয়ত অধিকতর গ্রাহ্য বলে আমাদের দ্বারাই স্বীকৃত হতে পারে। গীতায় নিরঙ্কুশ কর্তব্যের ধারণা সাধারণ বুদ্ধিতে কর্তব্য মাত্রই নিরঙ্কুশ বলে মনে হয়। কর্তব্য ও অকর্তব্যের মধ্যে পার্থক্য এই যে, যা মানুষের কর্তব্য তা কখনও তার অকর্তব্য হতে পারে না। যেমন সত্যভাষণ যদি আমাদের কর্তব্য হয় তাহলে বিপরীত ধর্মী আচরণ অর্থাৎ মিথ্যাভাষণ আমাদের কর্তব্য হতে পারে না। কর্তব্য নিরঙ্কুশ এই অর্থে যে কর্তব্য ব্যতিক্রমকে প্রশ্রয় দেয় না। সত্যের প্রতি অনুরাগ ও নিষ্ঠা অনেকের কাছেই নিরঙ্কুশ কর্তব্য বলে গৃহীত হয় একথা নৈতিক দ্বিকল্পের নানা দৃষ্টান্তে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রে আমরা সত্যবদ্ধ মানুষের পরিচয় পাই। তবুও একই সঙ্গে সত্য থেকে বিচ্যুতির ঘটনা মহাভারতে বিরল নয়। যেমন সত্যবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অর্জুন যুধিষ্ঠিরের প্রাণনাশ করেন নি, যদিও গাণ্ডীব গ্রহণ করার পূর্বশর্ত হিসাবে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণনাশ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে অর্জুন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করেন নি। একথার তাৎপর্য এই যে প্রতিজ্ঞা পালন করা বা সত্যভাষণ অর্জুনের কাছে নিঃশর্ত দায়বদ্ধতা বলে গণ্য হয় নি। সত্যরক্ষা করা এমন একটি কর্তব্য যাকে পরিস্থিতিসাপেক্ষে উপেক্ষা করা চলতে পারে। একজন মানুষের প্রাণরক্ষা করা, প্রতিজ্ঞা

রক্ষা করা বা সত্যভাষণের তুলনায় কর্তব্য হিসাবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সত্য ভাষণ করা নিঃশর্ত দায়বদ্ধতা নয়। কৃষ্ণ এইরূপ যুক্তি প্রদান করেছেন যে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা অথবা সত্য ভাষণ মানুষের নিঃশর্ত দায়বদ্ধতা নয়, বিশেষ করে যখন তার সঙ্গে পিতৃহত্যা, বা ভ্রাতৃহত্যা অথবা অনুরূপ কোন অন্যায় কাজের বিরোধ ঘটে।

অর্থাৎ এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়। বিষয়টি এই যে মানুষ কখনও কখনও অন্য কোন কর্তব্যের দাবির উপস্থিতিতে হয়ত আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক দাবিকে উপেক্ষা করে। নৈতিক দ্বিকল্পের নানা দৃষ্টান্তে একথা প্রকাশিত হয়েছে যে সত্যবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও একজন মানুষ সত্যচ্যুত হতে পারেন। যখন দুটি কর্তব্যের দাবী একই সঙ্গে আমাদের কাছে উপস্থিত হয় সেখানে যে নৈতিক দ্বিকল্পের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে কিসের ভিত্তিতে কোন একটি বিশেষ কর্তব্যকে নির্বাচন করা হবে? অর্জুনের মনে হয়েছে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণরক্ষা করা অন্য দাবির তুলনায় অনেক বেশী মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একথা মনে করার ভিত্তি কী হতে পারে? আমাদের মনে হয় যে আমরা বিভিন্ন মূল্যবোধকে সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে সংগ্রহ করে থাকি। সমাজ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে সত্যকথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্য। একইসঙ্গে সমাজ এই শিক্ষাও দেয় যে অত্যাচার, প্রাণহানি প্রভৃতির একথাই সম্ভবত: সত্য যে ধর্মের স্বরূপ কখনই সম্পর্ণরূপে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাই ধর্মকে 'নিহিতং গুহায়াং' বলা হয়েছে। আমরা আমাদের কর্তব্য অকর্তব্যকে কখনই সুস্পষ্টভাবে জানি না কারণ ধর্মের নির্দেশ কখনই সার্বিক বা স্থির নয়। তাই মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে আমরা ধর্মের নমনীয়তাকে লক্ষ্য করি। তবুও একথা সত্য নয় যে এই নমনীয়তার জন্য নৈতিক সূত্রের ধ্রুবত্ব এবং সার্বিকতাকে অস্বীকার করা চলে। পরিস্থিতি সাপেক্ষে নৈতিক সূত্র হয়ত কখনও কখনও নমনীয় হয়ে পড়ে। মানুষ তার নিজস্ব ব্যবহারিক প্রজ্ঞার আলোকে এবং তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নৈতিক সূত্রকে কিছুটা পরিবর্তনের সুযোগ গ্রহণ করে। আমরা মানুষের এই শিক্ষাকেই 'moral insight' বা নৈতিক অন্তর্দৃষ্টি বলে মনে করি। এই প্রসঙ্গে পুনরায় মতিলালের একটি বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। তিনি বলেছেন যে মানুষের নৈতিক চিন্তার ইতিহাসে আমরা দুপ্রকার ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাই। এক শ্রেণীর মানুষ কান্টের মতে সকল দায়বদ্ধতাকে সযত্নে পালন করার চেষ্টা করে। রামচন্দ্রের জীবনের ইতিহাস এই জাতীয় মানুষের দৃষ্টান্ত। তাদের ক্ষেত্রে ধর্মের কোন ব্যতিক্রম হয় না। অপর এক শ্রেণীর মানুষ নৈতিক দায়বদ্ধতার অনুরোধ থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারিক পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করেন না। কর্তব্য পালনের প্রতিটি পরিস্থিতির নিজস্বতা আছে তবুও তাকে অতিক্রম করা আবশ্যক হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ এই জাতীয় পুরুষের দৃষ্টান্ত। পরিস্থিতি যদি কর্তব্যের পরিবর্তন ঘটায় সেক্ষেত্রে কর্তব্য পালনের সার্বজনীন ভিত্তি ব্যক্তিগত অনুভবের সঙ্গে সার্বজনীন কল্যাণময় ও শিক্ষানিয় সিদ্ধান্ত আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় রত হওয়া আবশ্যক।

**গ্রন্থপঞ্জী:**

1) ঘোষ, জগদীশ চন্দ্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কলকাতা: প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৯৮৭.

2) চট্টোপাধ্যায়, তারা, গীতা-অনুচিন্তন, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৮.

3) চ্যাটার্জী, অমিতা, ভারতীয় ধর্মনীতি, কলকাতা: এলায়েড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৯৮.

4) বন্দোপাধ্যায়, জয়ন্তানুজ, সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা, কলকাতা: এলায়েড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৯৪.

5) বসু, গিরীন্দ্রশেখর, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কলকাতা: পারসীবাগান লেন গ্রন্থকার, ১৯৪৮.

6) বসু, শ্রীগিরীন্দ্রসশেখর, ভগবদগীতা, কলকাতা: বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ১৩৫৫.

7) বাসুদেবানন্দ, স্বামী, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, কলকাতা: স্বামী মুমুক্ষানন্দ উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬৮.

8) মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, নীতি যুক্তি ও ধর্ম, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৫.

9) 8) মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দগোপাল, গীতার কথা, কলকাতা: প্রাচী পাবলিকেশনস্, ২০০৬.

10) রামসুখদাস, স্বামী, শ্রীমদভগবদগীতা, গোরক্ষপুর: গীতাপ্রেস, ২০১৭,

11) সরস্বতী, মধুসূদন, ভগবদ্গীতা, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৮৬,

12) সেন, অতুলচন্দ্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৩৬,

---------